গরিব শ্রমজীবীর কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ধনীরা বিদেশে পাচার করে:বিদেশে অবৈধ অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে

কালো টাকা ও অবৈধ অর্থ পাচার রাজনৈতিক দলের বড় উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত

১. কর স্বর্গরাজ্য নামে পরিচিত দেশসমূহে অর্থ পাচার বেড়ে যাচ্ছে

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক' গত ৭ নভেম্বর, ২০১৩ Financial Secrecy Index (FSI)-2013 নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষায় ৮২টি দেশের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে OECD (Organization for Economic Cooperation Development) দেশসমূহ কিভাবে বিভিন্ন দেশ হতে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে নিজ দেশে বা তাদের আঞ্চলিক দেশসমূহে অর্থ স্থানান্তর করে ঐ সকল দেশসমূহের সামগ্রিক অর্থনীতিকে দূর্বল এবং ঋণগ্রস্ত করে তুলছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উন্নত দেশসমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ বা অঞ্চলসমূহে অর্থনৈতিক তথ্য গোপন রাখার হার সবচেয়ে বেশি, ফলে আর্থিক স্বচ্ছতার হার তুলনামূলকভাবে কম। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন গোপনীয় অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ ২১ হতে ৩২ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি)। ১৯৭০ সালের পর থেকে শুধু মাত্র আফ্রিকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে এবং এর বিপরীতে দেশটির মোট ঋণের পরিমাণ ১৯০ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি), যা ঐ পাচারকৃত অর্থের কাছে খুবই নগন্ন। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও মানি লন্ডারিং বা অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে ট্যাক্স স্বর্গরাজ্য নামে পরিচিত দেশসমূহে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে।

২. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

– বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় ২০হাজার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে, ১০ থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার প্রাইজিং (কম মূল্যে আমদানি দাম দেখানো) এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রাণীতি অনুযায়ী এদেশ হতে বিদেশে ৫ হাজার ডলার বেশি অর্থ পাঠানো যায়না। চিকিৎসা/শিক্ষা ব্যয়ের জন্য বিদেশে

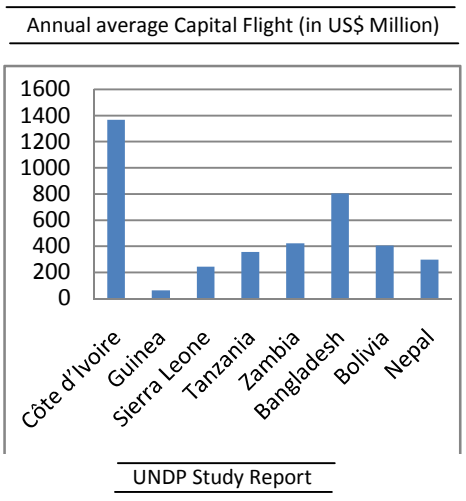

টাকা পাঠাতে গেলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। তাহলে, এত টাকা পাচার হলো কী করে?

– জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর গত চার দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ের জাতীয় বাজেটের দেড় গুনের সমান। এ অর্থ পাচার না হলে দেশের প্রবৃদ্ধি আরও বহুগুনে বেড়ে যেত। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৬ হাজার ২৪০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ টাকা পাচার হচ্ছে পণ্যের আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে। উন্নয়নশীল ৮টি দেশ থেকে অর্থ পাচার বিষয়ক এই প্রতিবেদন অনুযায়ী টাকা পাচারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্ট।*[আমাদের বুধবার, ০১-০৬-২০১৪]*

- Global Financial Integrity (GFI) এর ২০১৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৩-২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১৮.৪১ বিলিয়ন ডলার বা ১.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়, যা থেকে সরকার কমপক্ষে প্রায় ৩৫,৯০৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারতো। মূলত ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে ব্যাপকভাবে অর্থ পাচার হলেও, ২০১১ এর তুলনায় ২০১৪ সালে ৫ গুনের বেশি অর্থ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়। ২০১১ সাল থেকেই শেয়ার বাজার, সোনালী ও বেসিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপসহ বিভিন্ন কোম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটতে থাকে। আয়কর বিভাগের তথ্যমতে এসব টাকা কারো নামে জমা হয়নি। তাহলে এতো টাকা গেলো কোথায়? *[আমাদের বুধবার: ২৫-০৩-২০১৫]*

৩. বিদেশের 'সেকেন্ড হোম' : মুদ্রা পাচার বন্ধ হবে কি?

মালয়েশিয়া'র 'মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম' (এমএমটুএইচ)-এর সুবিধা গ্রহণকারীদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশীরা রয়েছেন দ্বিতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশের ঠিক আগে রয়েছে চীন। দেখা গেছে যে, গত দুই বছর অর্থাৎ ২০১১ ও ২০১২ সালে বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে সেকেন্ড হোম সুযোগ গ্রহণের মাত্রা বেড়েছে। ২০০২ সালে এ সুবিধা চালুর পর থেকে ২০১৩

সালের জুন পর্যন্ত ২৩৭০ জন বাংলাদেশী ' সেকেন্ড হোম' সুবিধা নিয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় প্লট-ফ্ল্যাট কেনা বাবদ গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি পাচার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সেকেন্ড হোমের সুবিধা নেয়ার প্রয়োজনে ৬,০০০ কোটি টাকা এবং সরাসরি প্লট বা ফ্ল্যাট কেনা বাবদ ৪,০০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এক অনুসন্ধানে দেখেছে, এসব অর্থ পণ্যের আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় নিয়ে গেছে ঐ কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণকারীরা। এভাবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, কানাডাসহ সহ ধনী বিশ্বের অংশ হয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক কালো টাকার মালিক। ইউএনডিপি তাদের সমীক্ষায় উল্লেখ করে যে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারি ক্ষমতার শেষ সময়ে এ ধরনের অর্থ পাচারের প্রবণতা বেড়ে যায় *[আমাদের বুধবার: ২৮-১০-২০১৪]।*

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কানাডার একটি স্থান 'বেগম নগর' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। সেখানে বসবাস করছে বাংলাদেশের ধনীদের 'বেগম' ও ছেলেমেয়েরা। কানাডায় এক কোটি ১০ লাখ টাকা দিলেই পাওয়া যায় নাগরিকত্ব। বাংলাদেশের অনেক ধনীই এ নাগরিকত্ব কিনে তাদের বেগমদের বাড়ি-সম্পত্তিসহ সেখানে রেখে দিয়েছেন। ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কানাডায় বাংলাদেশ থেকে এভাবে অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২লক্ষ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের এক অর্থ বছরের বাজেটের প্রায় সমান *[প্রথম আলো: ২৬ -০৫-২০১৩]।*

৪. সুইস ব্যাংকে টাকা পাচার

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৩' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সারা দুনিয়া থেকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় মোট গচ্ছিত অর্থ কমলেও ভারত ও বাংলাদেশ থেকে তা বেড়েছে। ২০১৩ সাল শেষে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের অন্তত ৩৭.১৯ কোটি সুইস ফ্রাঁ গচ্ছিত রয়েছে, যা প্রায় ৩,১৬২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। একই সময়ে ভারতীয়দের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ১৯৫.২৮ কোটি সুইস ফ্রাঁ, বা প্রায় ১৩,৬০০ কোটি রুপি। 'ইলিসিট ফিন্যান্সিয়াল ফ্লোস ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিস: ২০০২-২০১১' নামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালে ভারত অবৈধ টাকা বিদেশে পাচারের ক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। উল্লেখিত সময়ে দেশটি থেকে প্রায় ৮৫ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়। সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানে ৬২% বেড়েছে এবং একই সময়ে ভারতীয়দের অর্থ বেড়েছে প্রায় ৪৫%। সরকার ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য যে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা (১৮,০৬৯ কোটি টাকা) ধার্য করেছিল, এটি তার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। *[প্রথম আলো: ২৩-০৬-২০১৪]।*

বিভিন্ন সময়ে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের গচ্ছিত টাকা

সাল	গচ্ছিত সুইস ফ্রাঁ হিসেবে	গচ্ছিত সমপরিমাণ টাকা হিসেবে
২০১৩	৩৭.১৯ কোটি	৩,১৬২ কোটি ৩৭ লাখ
২০১২	২২.৮৯ কোটি	১,৯০৮ কোটি টাকা
২০১১	১৫.২৩ কোটি	১,২৯৫ কোটি টাকা
২০১০	২৩.৬০ কোটি	১,৯৬৮ কোটি টাকা
২০০৯	১৪.৯০ কোটি	১,২৪১ কোটি টাকা
২০০৮	১০.৭০ কোটি	৮৯২ কোটি টাকা

সূত্র: সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৩' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন

৫. ভারত পারলে আমরা পারছিনা কেন?

ভারত সরকার সুইস ব্যাংকগুলোতে তার নাগরিকদের কর্তৃক অর্থ পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সুইস সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। যার মাধ্যমে সুইস ব্যাংকে অর্থ জমাকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে ভারত চাইলে সুইজারল্যান্ডে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। বাংলাদেশ এ ধরনের চুক্তির সুযোগ নিতে পারেনি। ২০০৭ সালে সুইজারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের একটি 'ডাবল ট্যাক্স ট্রিটি' চুক্তি হয়। সুইজারল্যান্ড এটি অনুমোদন করতে দুই বছর সময় নেয়। এই চুক্তির মাধ্যমে কোনও নাগরিক কর ফাঁকি দিয়ে সুইজারল্যান্ডের কোনও ব্যাংকে টাকা জমা করেছে সন্দেহ করলে সরকার তার ব্যাংক একাউন্ট সম্পর্কে সকল তথ্য চাইতে পারতো। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার চুক্তিতে এ ধরনের কোনও ধারা রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। ভারতসহ অন্য অনেক দেশ এ সুযোগ গ্রহণ করলেও বাংলাদেশ এটা এড়িয়ে যায় এবং গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে সুইজারল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করে।

ভারতের বর্তমান সরকার কালো টাকা তদন্তে বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করেছে। ভারত এবং সুইস সরকারের মধ্যে কর সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন হওয়ায় সুইস সরকার ভারত সরকারকে যেসকল ভারতীয়রা কর ফাঁকি এবং কর প্রতারণার মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অবৈধ অর্থ গচ্ছিত রেখেছে, সে সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি ও তা উদ্ধারে সহায়তা দেবে।

২০১২ সালের মে মাসে ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত আন্তঃদেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ইতিমধ্যে দেশটি ৮টি দেশের সাথে TIEAs চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত বিগত ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে *(Source: White paper on Black money, India 2012)।*

৬. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

ক. বিদেশে পাচারকৃত কালো টাকা সংক্রান্ত আইনী পদক্ষেপ

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। সংসদের বর্তমান অধিবেশনে নতুন একটি আইনের প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে প্রস্তাবিত এই আইনটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- বৈদেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন করলে, কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান
- এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ মীমাংসার জন্য

মীমাংসা কমিশন (Settlement Commission) এর কাছে যেতে পারবেন না।

- আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা হবে।
- আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকবে।

খ. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কালো টাকা প্রতিরোধে আইনী পদক্ষেপ

দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধ বিল নামের আরও একটি আইনের বিল লোকসভার বর্তমান অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে।

- সরকার ধারণা করছে যে, এই আইন বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে আবাসন খাতে বেনামী সম্পদের মাধ্যমে কালো টাকা অর্জনের একটি বড় পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। মূল মালিকের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের নামে সম্পদ করা বা রাখাকেই বেনামী সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।
- ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার ক্ষেত্রে Personal Identification Number (PIN) থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর এ ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগত লেনদেনও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।
- আইন বাস্তবায়ন জোরালো করতে, Centre Board of Taxes এবং Central Board of Excise and Custom কারিগরি দক্ষতা বাড়াবে এবং পরস্পরের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করবে।

৭. পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব ?

দেশের প্রচলিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধে বাংলাদেশসহ ১৪৭টি দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা "এগমন্ট গ্রুপ" এর সাথে জুলাই ২০১৩-এ চুক্তি সম্পাদন করায় এই পাচার করা অর্থের তথ্য পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও সুইজারল্যান্ড-এর সাথে অর্থ পাচার সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের চুক্তি করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে "Financial Action Taskforce (FAT)" এর আওতায় "Asia-Pacific Group on Money Laundering" এগমন্ট গ্রুপ-এর আওতায় বিভিন্ন দেশকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করলে এই পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করায় বাংলাদেশ সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার উৎস বন্ধ এবং সুইস ব্যাংক সহ 'কর-স্বর্গ' বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত সকল অবৈধ অর্থ উদ্ধারে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর এবং দুদকের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

৮. আমাদের দাবি

- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যেসব বাংলাদেশী নাগরিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সকল অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন,
  - ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার PIN ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা
  - ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা
- হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংক সহ শেয়ার বাজার কেলেংকারীর আত্মসাতকৃত টাকা কোথায় গেলো তার উপর তদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- সম্প্রতিক বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অভিবাসী পাচারের সাথে মোবাইলে টাকা পাঠানোর বিষয়টি জড়িত এবং এই টাকা কিভাবে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া যায় তা খতিয়ে দেখতে হবে, পাশাপাশি আমরা এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ব্যাখ্যা দাবি করছি।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। বিশেষ করে ওভার/আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয় করলো তা অডিট করে এর রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এনবিআর-কে প্রদেয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে

আয়োজক সংগঠনসমূহ:

অর্পন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, এসডিও, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, কৃষাণী সভা, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডোক্যাপ, নেচার ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ, প্রান্তজন, বিএএফএলএফ, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, ভয়েস, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম, সংগ্রাম, সিনার্জী ইনস্টিটিউট ও হিউম্যানিটি ওয়াচ।

সচিবালয় ঃ ইক্যুইটিবিডি, বাড়িঃ ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়ঃ ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৮১২৫১৮১/ ৯১১৮৪৩৫, ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org